যুগান্তর

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে ছেলেটা খুব বিপদে আছে

মোকাম্মেল হোসেন

খেতে বসেছি। সঙ্গে লবণ বেগম ও তিন ছেলে। ছেলেদের মধ্যে মেজোজনের নাম শাফিন। সে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। শাফিনের খাওয়ার গতি দেখে বললাম—

: বাচ্চা, আস্তে খাও।

গতির পরিবর্তন হল না। অবাক হলাম। আরে বাবা! এ কি মানুষ, না রোবট? মনে হচ্ছে, রোবট। রোবটের সফটওয়্যারে নির্দেশমালাগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে, সেভাবেই সে চলবে; এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। রোবোটিক আচরণের অধিকারী ছেলেটিকে এ মুহূর্তে খুবই অচেনা মনে হচ্ছে! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম— এ রোবটের নির্মাতা কে! লবণ বেগম অ্যান্ড কোং, না টিচার অ্যান্ড গং, নাকি রাষ্ট্র অ্যান্ড মং? একরত্তি একটা ছেলে চোখের সামনে রোবট হয়ে যাচ্ছে— এটা মেনে নেয়া কঠিন। গলায় আবেগের পরিমাণ দ্বিগুণ করে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। এবার আর কথাগুলো মাটিতে পড়ার সুযোগ পেল না। লবণ বেগমের ফরমান ভেসে এলো—

: শাফিন— তাড়াতাড়ি। কুইক।

রোবট কার কথা শুনবে? যন্ত্রকৌশলের বিধান অনুযায়ী রোবটের সামনে আবেগের ঝর্ণাধারা কেন, সমুদ্র নিয়ে হাজির হলেও সে অন্য কারো কমান্ড মানবে না। সে শুধু মানবে তার আবিষ্কর্তার কমান্ড। শাফিনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সে যান্ত্রিক চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করল। কিছু একটা বলা দরকার। বলা মানে তর্কে জড়ানো। খেতে বসে তর্কে জড়ানো কি ঠিক হবে? যে কোনো ধরনের এবাদতে একাগ্রতা ও নীরবতা প্রয়োজন। খাওয়াও এক ধরনের এবাদত। অনেকেই মনে করে, কেবল নামাজের সময় নীরবতা ও একাগ্রতার নিয়ম পালন করলেই চলে। এটা ঠিক না। করুণাময় স্রষ্টার নেয়ামত গ্রহণের সময়ও নীরবতা ও একাগ্রতার প্রয়োজন রয়েছে।

তর্কের পথ পরিহার করতে হলে আমার এখন এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত— যাতে সাপ পরকালের বাসিন্দা হয়, আবার লাঠিটাও না ভাঙে। কোমলস্বরে ছেলের উদ্দেশে বললাম—

: আব্বু, মুখের খাবারগুলা ভালা কইরা চিবাইয়া খাও। ভালা কইরা চিবাইয়া না খাইলে...

এবার ফরমান নয়, হুংকার। লবণ বেগমের হুংকারে পরামর্শের বাকি অংশ আমার মুখগহ্বরে জট পাকিয়ে অদ্ভুত শব্দতরঙ্গের জন্ম দিল। তাড়াতাড়ি পানির গ্লাস হাতে নিলাম। পানির সাহায্যে মুখের ভেতর জট পাকানো কথাগুলো পেটে চালান করে স্বস্তির ঢেঁকুর তুলতেই লবণ বেগম ছেলেকে বলল—

: কিসের চিবাচিবি? চিবাচিবির সময় নাই। শুধু গিলবা।

কথার পৃষ্ঠে কথা বলা ভালো স্বভাবের পরিচয় বহন করে না। নীরব হলাম। নীরবতায় মুক্তি মিলল না। চেতনার জগতে যুক্তির বুদ্বুদ ফুলে-ফেঁপে প্রবল চাপ সৃষ্টি করল। চাপ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, এগুলো নিভাশনের ব্যবস্থা করা। কোনো কারণে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে এবাদতের মাঝখানে ব্রেক কষে নরম-গরম বাক্য নির্গত করার নিয়ম আছে কিনা, জানা নেই। থাকুক, বা না থাকুক— জান বাঁচানো ফরজ। জীবন বাঁচানোর তাগিদে লবণ বেগমের উদ্দেশে বয়ান করলাম—

গিলাগিলির সিস্টেম হইল গরু-ছাগলের জন্য। তারা প্রথমে শুধু চাবার গিলে, তারপর অবসর মুহূর্তে শুইয়া-বইসা জাবর কাইটা খাইওলা পাকস্থলীতে পাঠায়। আল্লাহপাক মানুষরে এই ক্ষমতা দেন নাই। সৃষ্টির বিধান লংঘন কইরা মানুষ যদি দুই মিনিটে খায় আর এক মিনিটে লেদায়, তাইলে এর পরিণাম শুভ হয় না।

আমার বিস্ফোরণ কতটা মারাত্মক হবে, জানা নেই। অজানা আতংকে কয়েক মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর অবিশ্বাস্য চোখে দেখলাম, লবণ বেগম গম্ভীর মুখে রান্নাঘরে ঢুকছে। রান্নাঘর থেকে সে ছোট্ট একটা মাদুর নিয়ে এলো। মাঝে মধ্যে বিকেলবেলা পরিবারের সবাই বাসার ছাদে গোল হয়ে বসার কাজে এ মাদুর ব্যবহৃত হয়। লবণ বেগম রাগ করে এখন ছাদে চলে যাবে নাকি? বুঝতে পারছি না। দেখলাম, আমার অনুমান সত্য নয়। লবণ বেগম মাদুরটা মেঝেতে রেখে তার উপর একটা চাদর বিছালো। ঘরে পুরনো একটা দস্তরখানা ছিল। চাদরের উপর সেটা বিছিয়ে সে বলল—

: শাফিন, আসো।

শাফিন একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে, চোখের সামনে যা ঘটছে— তা জিন্দা জগতের নয়, স্বপ্ন জগতের কারবার। অস্ফুট স্বরে বললাম—

লবণ বেগম আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। চোখ-মুখ কঠিন করে কোনো মানুষ যখন হাসে, তখন বুঝতে হবে— তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছে। লবণ বেগমের চেহারায় এখন তারই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য! আমার ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ার কী আছে! ছেলেকে ধীরে-সুস্থে খেতে বলা কি অপরাধ? না, আর নীরব থাকার উপায় নেই। প্রতিবাদী কণ্ঠে বললাম—

: তুমি এইসব কী শুরু করছ?

— কী শুরু করছি!

: খাবার টেবিল রাইখ্যা শাফিনরে নিচে যাইতে বলতেছ কেন?

— বারে! তুমিই তো তোমার ছেলের জন্য আকবরী স্টাইলে খানাপিনার এন্তেজাম করতে বললা। অবশ্য আয়োজনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। মোগল সম্রাট আকবর নিশ্চয়ই মাদুরের উপর বইসা এইসব লতা-পাতা জাতীয় খাবার খাইতেন না। কী আর করবা! যেইরকম অবস্থা, সেইরকম ব্যবস্থা। তোমার ভাণ্ডার ঠনঠনা না থাকলে ছেলের জন্য বিরিয়ানি-বোরহানির আয়োজন করতাম।

মাদুর না বিছাইয়া কার্পেট বিছাইতাম।

আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে উঠলে মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য একটা অজুহাত তৈরি করে রণে ভঙ্গ দেয়াই উত্তম। উত্তম পথের পথিক সেজে বললাম—

: ধুর-উ! একজনের জন্য চাইরজনের খাওয়া নষ্ট। শাফিন, তুমি দ্রুত খাওয়া শেষ কইরা পড়ার টেবিলে যাও...

খাওয়ার নিয়ম ঘুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঘুম-বিধি বাস্তবায়নের জন্য লবণ বেগম নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাজ হচ্ছে না। দেখা যায়, পড়ার টেবিলে দেড়-দুই ঘণ্টা পার না হতেই শাফিন ঢুলতে শুরু করে। প্রতিদিন এই নিয়ে হুজ্জত-হাঙ্গামা। টেলিভিশনের সামনে বসে চ্যানেল টু চ্যানেল পরিভ্রমণ করছি— যুদ্ধসাজে সজ্জিতা লবণ বেগম হাত থেকে রিমোট নিয়ে ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বলল—

: শাফিনরে লইয়া আমি তো পাগল হইয়া যাইতেছি। তুমি আমারে একটা বুদ্ধি দেও।

— শাফিন পড়ে না?

: না।

— কী করে?

: কী আর করবে— ঝিমাইতেছে।

— অঃ।

: অ-আ না কইরা তুমি আমারে কও— ওর পড়াটা হবে কখন? সকালবেলা মোচড়ামুচড়ি করতে করতে সাতটা বাজায়। এরপর [illegible] কইরা স্কুলে যায়। স্কুল থেকেরা আসার পর খাওয়া-ফেরার পর কম্পিউটারে গেইম, ছোটভাইয়ের সঙ্গে হৈচৈ আর টাইডি-নাইডি কইরা সময় পার করে। আছরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্য নিচে যাওয়ার বায়না ধরে। লাফালাফি কইরা আসার পর পড়তে বসলেই তার টাল্টি-বাল্টি শুরু হইয়া যায়। একটা মডেল টেস্ট দিছি— অর্ধেকও শেষ করতে পারে নাই, চোখ কচলাকচলি শুরু হইয়া গেছে। অহন আমি কি ওরে পিটাব?

: অবশ্যই না। মাইরপিট কইরা কাজ হয় না। তুমি তারে ভালা কইরা বোঝাও।

— তোমার ছেলেরে তুমি বোঝাও। আমি পারব না।

ছেলেদের পড়ার রুমে ঢুকলাম। শাফিন ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকাল। তার চোখের পাতায় ভর করা ঘুমের মাত্রা পরিমাপ করতে করতে বললাম—

: ওচ্চু-পুচ্চু, ঘুম পাইছে?

— হুঁ।

: চল, ঘুমাই।

শাফিন পাথর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চুলে বিলি কেটে বললাম—

: তবে একটা শর্ত আছে।

— কী!

: ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়তে হবে। রাজি?

— হুঁ।

: হুঁ-না। কও, রাজি।

— আইচ্ছা।

: আইচ্ছা না— কও, রাজি।

— রাজি।

পরদিন অফিসে বসে কাজ করছি। পাশের মসজিদ থেকে আছরের আজান ভেসে আসতেই ফোন বেজে উঠল। ওপাশ থেকে কাঁদো-কাঁদো স্বরে শাফিন বলল—

: আম্মু আমারে নিচে যাইতে দেয় না।

— কেন?

: জানি না।

— তোমার আম্মুর হাতে ফোনটা দেও।

ফোন হাত বদল হওয়ার পর বললাম—

: তাসিনের আম্মু, কী সমস্যা?

— কিসের সমস্যা?

: শাফিনরে নিচে যাইতে দিতেছ না কেন?

দীর্ঘক্ষণ নীরবতায় কাটল। উপযাচক হয়ে বললাম—

: এক ঘণ্টার জন্য নিচে যাইতে দেও। মাগরিবের আজানের আগেই চইল্যা আসবে।

বিস্ফোরণ ঘটল। লবণ বেগম চেঁচিয়ে বলল—

: তোমার মাথা কি ঠিক আছে? নভেম্বরের ২২ তারিখে ওর সমাপনী পরীক্ষা। মাঝখানে সময় আছে কয়দিন? স্কুল থেইকা আইজ আমার মুচলেকা নিছে, প্রি-টেস্টে সব সাবজেক্টে ৭০ পার্সেন্টের কম নম্বর পাইলে শাফিনরে পরীক্ষা দিতে দিবে না।

— ৭০ পার্সেন্টের কম নম্বর পাইলে অসুবিধা কী?

: অসুবিধা কী মানে? প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় ৭০ পার্সেন্টের কম নম্বর পাইলে সমাপনীতে ও কী কইরা জিপিএ ফাইভ পাবে!

— জিপিএ ফাইভ পাওয়া কি খুব জরুরি?

: তোমার কাছে জরুরি মনে হইতে না পারে। আমার কাছে খুবই জরুরি। সমাপনীতে এই ছেলে জিপিএ ফাইভ না পাইলে পরে আর কোনোখানে পাত্তা পাবে না। তাছাড়া আমি মানুষের কাছে মুখ দেখাব কী কইরা?

এরপর এ বিষয়ে কথা বলা নিরর্থক। লবণ বেগম কয়েকবার হ্যালো-হ্যালো বলে ফোন রেখে দিল। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। জিপিএ ফাইভ প্রত্যাশী একজন মায়ের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারি না। শতভাগ জিপিএ ফাইভ প্রত্যাশী স্কুলের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারি না। জিপিএ ফাইভের জোয়ারে দেশ প্লাবিত করার ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারি না। আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি—

: ইয়া মাবুদ! সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে আমার ছেলেটা খুব বিপদে আছে। এ পরীক্ষা ওর শৈশবের সব আনন্দ গিলে খাচ্ছে। তুমি ওর শৈশবকে রক্ষা কর...

মোকাম্মেল হোসেন : সাংবাদিক